তারিখ ..... 3 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ .....

পকেটে ভিসির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটির অনিয়ম-দুর্নীতি উদ্ঘাটনে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রধান অধ্যাপক আতফুল হাই শিবলী যুগান্তরকে জানিয়েছেন, তদন্তে অর্থ আত্মসাতের বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর পর করণীয় নির্ধারণ করতে তদন্ত কমিটি একাধিকবার বৈঠক করেছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে ভিসি অধ্যাপক সাদেকসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার। সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়টির অনিয়ম বন্ধ করতে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়কে তারা চিঠি দেবেন। কেননা, পদাধিকারবলে রাষ্ট্রপতি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর।

১৯৯৬ সালে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। টিউশন ফি'সহ আনুষঙ্গিক ব্যয় তুলনামূলক কম হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়টি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু কয়েক বছর না যেতেই এ বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাপক শিক্ষাবাণিজ্যে জড়িয়ে পড়ে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়টির বিরুদ্ধে শিক্ষা, সনদ, বিক্রির মতো ঘৃণ্য অপরাধের অভিযোগও ওঠে। কয়েকটি তদন্তে তা প্রমাণিতও হয়। এভাবে অব্যাহত অনিয়ম-দুর্নীতির জন্য ২০০৯ সালে এশিয়ান ইউনিভার্সিটিকে সরকার কালো তালিকাভুক্ত ও দুর্নীতিগ্রস্ত বিশ্ববিদ্যালয় বলে ঘোষণা করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান বর্জন করেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান। এর পর থেকে অদ্যাবধি বিশ্ববিদ্যালয়টির আর কোনো সমাবর্তন হয়নি। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়টির কয়েক হাজার শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত সনদ হতাশাও আটকে আছে।

ভিসি অধ্যাপক আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক সব অভিযোগ অস্বীকার করে সোমবার তার উত্তরায় বাসভবনে যুগান্তরকে বলেন, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। কিছু নিকটাত্মীয়কে তিনি দায়িত্বপালন হয়ে ইউনিভার্সিটিতে চাকরি দিয়েছিলেন। তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করেন। একাধিক তদন্তে অর্থ আত্মসাতের এসব ঘটনা বেরিয়ে আসার পর দোষীদের চাকরিচ্যুত করা হয়। তারাই উদ্দেশ্যমূলকভাবে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ভিসি পদে তিনি এখনও বহাল আছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো টাকা-পয়সা তিনি আত্মসাৎ করেননি।

অভাবনীয় সব দুর্নীতি : বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টিবোর্ড ২০১১ সালের ১৭ নভেম্বর ভিসির অনিয়ম ও দুর্নীতি অনুসন্ধানে একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটি ১১ ডিসেম্বর ট্রাস্টিবোর্ডের কাছে প্রতিবেদন জমা দেয়। এই তদন্ত রিপোর্টে বেরিয়ে আসা উল্লেখযোগ্য দুর্নীতি চিত্রের মধ্যে রয়েছে, ভিসি অধ্যাপক সাদেক বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকায় আশুলিয়ায় ১০ বিঘা জমি কিনলেও তা রেজিস্ট্রি করেন নিজের ও স্ত্রী সালেহা সাদেকের নামে। দলিলে এই জমির মূল্য ২৫ কোটি টাকা উল্লেখ করা হলেও বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় দ্বিগুণ। মতিঝিলের ২৮/১ টয়েনবি সার্কুলার রোডে অধ্যাপক সাদেকের নামে রয়েছে ২৭ কোটি টাকা মূল্যের একটি বহুতল ভবন। এ ভবনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকায় কেনা হলেও অধ্যাপক সাদেক মাসিক ১৪ লাখ টাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ভাড়া নিয়েছেন। তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ আত্মসাৎ করে ভিসি নিজের ও পরিবারের সদস্যদের নামে সম্পত্তির পাহাড় গড়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে জমা নেয়া ২০১০ শিক্ষাবর্ষের আর্থিক প্রতিবেদনে ভিসি অধ্যাপক সাদেক বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় দেখিয়েছেন ১৭ কোটি ৩২ লাখ ৬০ হাজার ৯১৪ টাকা। কিন্তু ট্রাস্টিবোর্ড তদন্ত করতে গিয়ে দেখতে পায় প্রকৃত আয় গোপন করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে মিথ্যা আর্থিক প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়েছে। তদন্তে বেরিয়ে আসে ২০১০ শিক্ষাবর্ষে শুধু উত্তরায় প্রধান ক্যাম্পাসের একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয় ১৮ কোটি ৪২ লাখ টাকা। এছাড়া এ শিক্ষাবর্ষে রাজশাহী ও খুলনা ক্যাম্পাস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় ছিল ৯ কোটি ৫০ লাখ ৬২ হাজার ৬৫৭ টাকা। দুটি আউটার ক্যাম্পাস ও উত্তরায় প্রধান ক্যাম্পাসের মোট আয় দাঁড়ায় ২৭ কোটি ৯২ লাখ ৬২ হাজার ৬৫৭ টাকা। এখানেই ১০ কোটি টাকারও বেশি আয় গোপন করা হয়। ট্রাস্টিবোর্ড তদন্ত করতে গিয়ে আরও দেখতে পায়, উত্তরা ক্যাম্পাসের নামে ২টি অ্যাকাউন্ট (এক্সিম ব্যাংক ০১৫১২১০০০৩১৬৪১ ও সোনালী ইসলামী ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর ০২৪১৩৬০০০০৯৭৪), ধানমন্ডি ক্যাম্পাসের নামে ৩টি অ্যাকাউন্ট ও আউটার ক্যাম্পাসের নামে গাইবান্ধা, রংপুর, চট্টগ্রাম, পাবনা, টাঙ্গাইল, ভালুকপুর, বগুড়া ও মৌলভীবাজারে ব্রাক ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের আরও ৮টি অ্যাকাউন্টে জমাকৃত আয় গোপন করা হয়েছে। তদন্তে বেরিয়ে আসে ২০১০ শিক্ষাবর্ষে এসব অ্যাকাউন্টে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল অন্তত ৭০ কোটি টাকা। অথচ তিনি আয় দেখিয়েছেন মাত্র ১৭ কোটি ৩২ লাখ ৯১৪ টাকা। বাকি টাকা ভিসি আত্মসাৎ করেছেন। এভাবে ১৬ বছর ভিসি হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্ব পালন করার সময় তিনি ৬৫০ কোটি টাকা ব্যক্তিগতভাবে আত্মসাৎ করেছেন।

ট্রাস্টিবোর্ড তাদের তদন্ত প্রতিবেদনে বলেছে, 'অর্থ আত্মসাতের কৌশল হিসেবে ভিসি অধ্যাপক সাদেক বিভিন্ন ব্যাংকের মোট ৩৮টি অ্যাকাউন্টে বিশ্ববিদ্যালয়-সংক্রান্ত লেনদেন করেছেন। এতগুলো ব্যাংক অ্যাকাউন্টের প্রতিটি ভিসির একক স্বাক্ষরে পরিচালিত হচ্ছে। অথচ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ এর ৪৪(১) ধারায় বলা হয়েছে, ছাত্র বেতন, ফি ও অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ একটি সাধারণ তহবিলে জমা এবং ব্যয় করতে হবে। ওই তহবিল বোর্ড অব ট্রাস্টির কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা ও ট্রেজারারের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হতে হবে। ট্রাস্টিবোর্ডের তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৩৮টি ব্যাংক হিসাব থাকার বিষয়ে ভিসিকে তদন্ত কমিটি প্রশ্ন করলে ভিসি এর কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি।

রাষ্ট্রপতির কাছে দুর্নীতির সেই চিঠি : চলতি বছর ২ এপ্রিল ট্রাস্টিবোর্ডের আইন চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন ভিসির বিপুল অর্থ-সম্পদের নাগরিক প্রমাণসহ রাষ্ট্রপতির কাছে একটি পত্র পাঠান। ওই পত্রে বলা হয়েছে, অধ্যাপক সাদেক উত্তরায় একটি আলিশান বাড়ির মালিক (বাড়ি নম্বর ১৪, রোড নম্বর ২৮, সেক্টর ৭)। এ বাড়িটির দাম কমপক্ষে ২০ কোটি টাকা। এ ছাড়া ভিসির সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে— উত্তরার আজমপুরে ৫ কাঠা করে ৩টি প্লট। রাজধানীর অদূরে গাজীপুর জেলার পুবাইলের ভেমরপাড় মৌজায় ২৫ কোটি টাকা মূল্যের ৮ বিঘা জমি। সুন্দরবন ইউনিভার্সিটির নামে এক্সিম ব্যাংকের উত্তরা শাখায় অধ্যাপক সাদেকের ছেলে জাফর সাদেকের নামে ৩ কোটি টাকার এফডিআর। সুবাস নজর ভাসিতে একটি ২ কোটি টাকা মূল্যের ফ্ল্যাট। এর বাইরে ব্রাক আরাফা ইসলামী ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক, সোনালী ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের কয়েকটি শাখায় অধ্যাপক সাদেক ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে অন্তত ৩ কোটি টাকা থাকার প্রমাণ পেয়েছে ট্রাস্টিবোর্ড। এর মধ্যে ব্রাক আরাফা ইসলামী ব্যাংকের উত্তরা শাখায় ০১৭১১২০০৩৭২৭৩ নম্বর অ্যাকাউন্টে অধ্যাপক সাদেকের নামে ৮০ লাখ টাকার এফডিআর ও এক্সিম ব্যাংকে টুয়ে ইউনিভার্সিটির নামে একটি অ্যাকাউন্টে (নম্বর ০৫০৬৯৯/০১৫৬০১০০০১৪৯৭১) ৩ কোটি টাকার এফডিআর করে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া ব্রাক আরাফা ব্যাংকের উত্তরা শাখায় অ্যাকাউন্টে (নম্বর ০১৭১১২০০৮২৫৩৮) অধ্যাপক সাদেক ও তার স্ত্রী সালেহা সাদেকের নামে ৪০ লাখ টাকার এফডিআর এবং ৭১০৬০০০০১৫৩ নম্বর অ্যাকাউন্টে সালেহা সাদেকের নামে ১ কোটি টাকার এফডিআর রয়েছে। এমনকি অধ্যাপক সাদেক তার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের নিয়ে বাংলাদেশে সেকেন্ড হোম করেছেন। সেখানে সেকেন্ড হোম করতে তিনি ব্যয় করেছেন ৩ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরসহ কয়েকটি দেশে ভিসি অধ্যাপক সাদেক বিপুল পরিমাণ অর্থপাচার করেছেন এমন তথ্যও পেয়েছে ট্রাস্টিবোর্ড। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের 'মে ব্যাংকে' (অ্যাকাউন্ট নম্বর ১১৪৪২৩০২০৮২২) অধ্যাপক সাদেকের নামে অন্তত ১৭ কোটি টাকা জমা রয়েছে। ট্রাস্টিবোর্ডের সদস্যরা জানিয়েছেন, ভিসি ও তার পরিবারের সদস্যদের এত বিপুল সম্পদের মূল উৎস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোপাট করা অর্থ। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর দুর্নীতির দায়ে ভিসি, প্রধানমন্ত্রী সাদেককে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চাকরিচ্যুত ও বহিষ্কার করে নতুন ভিসি নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানায় ট্রাস্টিবোর্ড। একইসঙ্গে ভিসির আর্থিক দুর্নীতির বিষয়ে অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন ১৩ মার্চ একটি ও ২৫ মার্চ আরও একটি চিঠি দেয়া হয়। এ ছাড়া এনবিআর ও বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অনিয়ম-সংক্রান্ত গোয়েন্দা ইউনিটকেও চিঠি দিয়েছে ট্রাস্টিবোর্ড।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বক্তব্য : বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী যুগান্তরকে বলেন, এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ভিসির অনিয়ম সম্পর্কে তদন্ত চলছে। এ বিষয়ে তিনি তদন্ত কমিটির সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দেন। তদন্ত কমিটির প্রধান ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. আতফুল হাই শিবলী যুগান্তরকে বলেন, এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ভিসি অধ্যাপক সাদেকের বিরুদ্ধে বড় ধরনের আর্থিক অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি কাজ শেষ করে এনেছে। আগামী মাসেই তদন্ত প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। তিনি উল্লেখ করেন, এর আগেও দুটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেগুলোর বিষয়ে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে তা তাদের জানা নেই।

মঞ্জুরি কমিশনের সচিব মোঃ ফাদেল যুগান্তরকে বলেন, তিনি আগে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক ছিলেন। তখন একাধিক তদন্তে এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ভিসির নানা অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু কমিশনের আইন প্রয়োগের ক্ষমতা না থাকায় মন্ত্রণালয়কে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সুপারিশ করা ছাড়া এ বিষয়ে তাদের কিছু করণীয় নেই। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সহকারী পরিচালক (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) জেসমিন পারভিন যুগান্তরকে বলেন, এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে সার্টিফিকেট বিক্রির প্রতিযোগিতা প্রমাণিত হয়েছে। ২০০৯ সালে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের জন্য ১ হাজার ৫৩১ জন শিক্ষার্থীর তালিকা কমিশনে জমা দেয়া হয়। কিন্তু তদন্ত করে দেখা যায় ৮ হাজার শিক্ষার্থীকে সনদ দেয়া হয়েছে। এ ঘটনা তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর জিল্লুর রহমানকে জানানো হলে তিনি সমাবর্তন বয়কট করেন। কিন্তু তিনি তালিকাটির মাধ্যমে আরেক দফা সমাবর্তন অনুষ্ঠানের চেষ্টা করেন। কিন্তু তার সে চেষ্টা সফল হয়নি। জেসমিন পারভিন আরও বলেন, এসব শিক্ষার্থীর সাথে মঞ্জুরি কমিশন নেবে না বলে এশিয়ান ইউনিভার্সিটিকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি জানান, বড় ধরনের আর্থিক অনিয়মের একটি অভিযোগ তদন্তের জন্য দুদকে পাঠানো হয়েছে। মঞ্জুরি কমিশনের বেকশন অফিসার নাসিরা আক্তার খাতুন যুগান্তরকে জানান, ২০১০ সালের ১৩ জুন এশিয়ান ইউনিভার্সিটি-সংক্রান্ত দুটি তদন্ত প্রতিবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিল। ২৭ জুলাই মন্ত্রণালয় কমিশনকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তদন্ত প্রতিবেদন দুটি দুদকে পাঠানো হয়েছে। এর পর ২০১১ সালের ৩ নভেম্বর (স্মারক নম্বর ২২৪৫১) এক পত্রে দুদক মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে, ভিসির আর্থিক অনিয়মের বিষয়ে তারা প্রাথমিক অনুসন্ধান করবে। এর পর কি হয়েছে তা তারা জানেন না।

এ বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) যোগাযোগ করা হলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সংশ্লিষ্ট একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, তাদের অনুসন্ধান এখনও চলছে। কয়েকশ কোটি টাকা আত্মসাতের তদন্ত চলাকালেই আরও ৬৫০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। সেটিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। দুদকের দুর্নীতি অনুসন্ধান উইংয়ের ঢাকা-১ অঞ্চলের উপ-সহকারী পরিচালক জাফর আহমেদকে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। এ বিষয়ে জাফর আহমেদ যুগান্তরকে বলেন, ভিসির বিরুদ্ধে দুর্নীতি অনুসন্ধানের কার্যক্রম চলছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন-সংক্রান্ত কাগজপত্র ও সরাসরি কমিশনে জমা হওয়া ৬৫০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগের বিষয়গুলো সমন্বয় করে একসঙ্গে তদন্তের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কয়েকজন কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, সার্টিফিকেট বাণিজ্য, আর্থিক অনিয়ম, অবৈধ ক্যাম্পাস ও বোর্ড পরিচালনা-সংক্রান্ত বিষয়ে এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ভিসিকে অন্তত ১০ বার সতর্ক করা হয়। বেশ কয়েক দফা মিটিং করে আইন মেনে চলার জন্য সমঝোতাও বেঁধে দেয়া হয়। কিন্তু এশিয়ান ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ এসবকে পাত্তা দেয়নি। অবশ্য এশিয়ান ইউনিভার্সিটির একটি সূত্র জানিয়েছে, ভিসি অধ্যাপক সাদেক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কয়েকজন প্রভাবশালী কর্মকর্তাকে ম্যানেজ করে রেখেছেন। শিক্ষামন্ত্রণালয়েও তার 'নিজস্ব লোক' রয়েছে। এ ছাড়া রাষ্ট্রের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির বেয়াইকে ভিসি চাকরি দিয়েছেন। এ কারণে শত অনিয়ম করেও তিনি বহাল তবিয়তে আছেন।